BANGLA KOUNTERKULTURE ARCHIVE MAGAZINE

ODDJOINT

005 / AUGUST 2015

কভার ফটো: কিউ

ODDJOINT # বাংলাব্ল্যাক্

Bangla Kounterkulture Archive | curation Q | Surojit | Sucheta volunteers Suman | Avishek

ভাদ্র ১৪২২ ● অগাস্ট ২০১৫

১. কাইমেজি দীপক মজুমদার

বাইরে অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টি পড়ছে পাঞ্জাবে, দার্জিলিং-এ, রাজাবাজার, নাকতলা বা ফ্রেজারগঞ্জেও। যখনই বৃষ্টি হয় আগুন একটু নম্র হয় কিন্তু পোড়ানো বন্ধ করে না। 'এসো শিশু আগুন ধরাও'। সাফোর বাজনার মতো পাঁজর-আদরে বাজে এই জলধারাজ্ঞান; উসকে দেয় ঋত্বিক আগুন 'আমি পুড়ছি, ব্রহ্মাণ্ড পুড়ছে' চীৎকার করতে করতে সে ছুটে যায় ক্যামেরার লেনস-এর দিকে কাঁপা মানুষেরই বিস্তৃত আঙ্গুলদাগা হাতে সে প্রতিরোধ মুদ্রাসহ ধরে এবং অপর নিবিষ্ট হাতে ঢেলে দেয় মদ। পৃথিবীর যাবতীয় দর্শকের
চোখের ওপর। এই অতি সাধারণ নাটকীয়তার সৌন্দর্য 'যারা দেখতে পায় না গোলাপি' বা লাল চাল্‌শে-সোহাগে তারাই এর ওপর খোদাই করবে 'অতিনাটকীয়তা' শব্দখানি। সিদ্ধার্থ, চৈতন্য, হো চি মিন, সার্ত্র, জাঁ জেনে, সুকান্ত, আর্তো, লোরকা, রেণু বা ফাল্গুনী রায়ের অতিনাটকীয়তা। র‍্যাঁবো বলতেন 'বৃষ্টি ঝরে হৃদয় খামারে' সাদা-কালোর সন্ধি-সাম্রাজ্য বিচরণ যাকে সেই অবলোকন দিয়েছিল, দিয়েছিল ভূমধ্যসাগরীয় সূর্যও। সাফোর লেসবস দ্বীপে ঘুরে বেড়িয়ে দেখেছি। সাফো যত কেঁদেছেন গানে তত আগ্নেয়বিভাসে পুড়েছে লেসবসের সমুদ্রতট। বালি পেয়েছে ভস্মাকৃতি বিভূতি। পেয়েছে বললাম কেন হয়েছে না বলে? 'তোমার ওই শিকলভাঙা এমন রাঙা মূর্তি দেখি নাই।' অ্যাটলান্টিস মহাদেশের উৎস-সিঁথি 'সান্তরিনী' বা স্থানীয় য়ুনানি বোলচালে 'থীরা' দ্বীপে গিয়ে দেখেছি সেই বিস্ফোরক মহানাট্যের স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ বেঁচে রয়েছে দুটি স্তনাগ্র-বলয়; ওরা বলে 'কাইমেজি' ''পোড়া-মাই-জোড়া''। কী আশ্চর্য চিরন্তনী আগুনজলগাছপাথর খেলা! সভ্যতার স্বরূপের ওপর কি এর কোনো উত্তরাধিকার বর্তেছে! ■

দীপক মজুমদার

ছবি: সম্বরণ দাস

Bangla Kounterkulture Archive | curation Q | Surojit | Sucheta volunteers Suman | Avishek

ভাদ্র ১৪২২ ● অগাস্ট ২০১৫

২. তিনদিনের ওই উপবাসী দীপক মজুমদার

শক্ত ও শীর্ণ কয়েকটি আঙুলের চাঁটি আর আকস্মিক চেটোর চাপড়ে বোলপুর-নীচুবাঁধগোড়ার রামানন্দ খ্যাপা তাঁর ডুগি-দ্যুলোকে কাঁপিয়ে ঘোষণা করতেন "প্রভু চলেছেন কড়ুয়া হাতে, দেখলাম আমি তিনদিনের এই উপবাসী"। নাদতারা আরোহণের সেই ক্ষণচিন্তনী মনশ্চিত্রটি লেজার-মায়াবী ক্ষিপ্রতায় ঘিরে ধরত আমাদের। রুদ্ধশ্বাস ও রসরিক্ত আধুনিক সভ্যতার দুলাল আমরা কয়েকজন। সে এক অপূর্ব প্রবালপুঞ্জ। হিরণ, সেলিম, অমিত, গৌতম, গৌরখ্যাপা, সুবল, চিন্তামণি, দীনবন্ধু, পবন, স্বপন, জয়া খ্যেপা, সতীনাথ, সুনেত্রা, ভাস্কর, জর্জলুনো, ফ্রঁসিস, মিশেল। আরো পরে টিম, ক্রিস, ক্যামেলিয়া, আভী, গ্রোটাভস্কির দল, ফ্রাঁসোয়া, লেতিতসিয়া আর মিমলু প্যাট্রিস। স্তম্ভিত মুহ্যমান বিস্ময়ে আক্রান্ত হয়েছি আরো অনেকে ওই চলমান ছবিটির থাবায়।

কে ও উপবাসী? চৈতন্য মহাপ্রভু বাউল মুর্শিদ নিজে না সব মানুষেরই প্রতিনিধি এক সুধা অভিলাষী নিত্যযাত্রী? সকলের মধ্যেই লুকিয়ে থাকা এক অনুরাগবিদ্ধ আন্তর্সখ্যতা। যেন তির গিয়ে বিঁধেছে সোজা ষাঁড়ের চোখে এমনই এক আত্মহারা মগ্নতার লোকবৃত্তি।

ছেলেবেলার শান্তিনিকেতনে নবনীয় মূর্ত গোঙানি শুনতে পেতাম বহুদূর থেকে। কাশশরের ডাঁটির ওপর কানাওলা কাঁসার থালা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আসতেন সেই হরিনামের ফেরিওলা। সঙ্গে পূর্ণ আর রাধারাণী। গাইতেন, 'ভালো করে পড়গা ইশকুলে। নইলে কষ্ট পাবি শেষকালে।' এ সেই ছাগল, বাঁধাকপি আর নেকড়ে নিয়ে নৌকোয় নদী পার হওয়ার শিক্ষা! একেকবারে কেবল একটি বস্তু নিয়েই পেরোনো যাবে। অথচ মানুষ উপস্থিত না থাকলে নেকড়ে ছাগলকে বা ছাগল বাঁধাকপি খেয়ে ফেলবে। মানুষকে শিখতে হয় কীভাবে 'একটা সাপে নেউলে একটা ইঁদুর বিড়ালে, এক ঘরেতে বসত করে একই মিশোলে'।

বিখ্যাত রুশ দার্শনিক গুর্জেয়েভ জানাচ্ছেন 'অশোক' নামে এক শ্রমণ-গায়ক সম্প্রদায় ছিল ট্রান্সককেশিয়া,
এশিয়া মাইনর ও এশিয়ার সর্বত্র, বিশেষত বলকান অঞ্চলে। তারা গান গেয়ে নানা পাল্টাপাল্টির মাধ্যমে প্রাচ্যজগতের এক বিশিষ্ট আত্মজ্ঞান লোকায়তিক স্রোতে বইয়ে দিত। আজ তারা নিশ্চিহ্ন। গত শতাব্দীর শেষের দিকেও পারস্য, তুরস্ক, রুশ সীমান্তের ভান, কারাবাখ ও সুবাতান অঞ্চলে গুর্জয়েভ এঁদের গাথা পাল্টাপাল্টি শুনেছেন।

শ্রদ্ধেয় শশিভূষণ দাশগুপ্ত ষাটের দশকের গোড়ায় পানামায় অনুষ্ঠিত প্রাচ্যবিদ্যা কংগ্রেসে যোগ দিয়ে ফেরার পথে লণ্ডনে আর্নল্ড বাকের বাড়িতে কিছু সমসাময়িক নেপালি চর্যাগান শুনেছিলেন যার ভাষা জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও চর্যাদোহার মধ্যবর্তী স্তরের হদিশ দেয়। তখন স্টেটসম্যান পত্রিকায় সে খবর বেরিয়েছিল। পঞ্চাশের দশকে পূর্ণদাস, নির্মলেন্দু চৌধুরী ও সুচিত্রা মিত্র বলকান অঞ্চলে বিশ্বশান্তি কংগ্রেসে যোগদানের সূত্রে গান গেয়ে শ্রোতাদের মাতিয়ে তোলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্থায়ী ভেকস্বরূপ আলখাল্লাটি পেয়েছিলেন পারস্যে। হিসেবটা কঠিন নয়। পন্দস, খোরসান, নেপাল, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, কুষ্ঠিয়া, আরাকান এমনকি চীনের সেৎজুয়ান। সে যাই হোক, আপাতত বইমেলা-আদৃত আনন্দটোলের পণ্ডিতরা 'গভীর নির্জন পথে' ঘোরাফেরা করছেন আর মল, মূত্র, শুক্র, রজ ইত্যাদির মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন। লুম্পেন যুবশক্তি বাউল জগতে উঁকি মারছে অর্গলবদ্ধ গোঁড়ামিধ্বস্ত সমাজের দরজার ফুটো দিয়ে। পাশ্চাত্যের লোক-ঐতিহ্যেরও একই দশা। বাউল সমাজের সীমান্তবর্তিতা প্রগতিক্লিষ্ট গাঙ্গেয় উপত্যকায় তীব্রতর। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে মনসুরুদ্দিন সাহেব যখন কলকাতা-শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন তখন কেউকেটারা তাঁকে বগলদাবা করে কিছুদিন পর ঢাকায় ফেরত পাঠিয়েছিলেন। অথ বাংলার বাউল কথা।

সম্পূর্ণভাবে বাউলদের উদ্যোগে কলকাতার উপকণ্ঠে, ঘুটিয়ারি শরিফের অদূরে, বোড়ালে, এটি তৃতীয় বাৎসরিক বাউল মহোৎসব। বাঁকুড়ার নবাসন থেকে বাউল লোকগুরু হরিপদ গোঁসাই ও গোঁসাই মা-র ডাকে এবারও আসবেন অনেক সাধক শিল্পী বাউল তাঁদের অপার দিব্যমানবিক ঐশ্বর্য ঢেলে দিতে। প্রার্থনা করি এবারের মহোৎসব সকলের প্রকৃত অন্তর্নিহিত সম্পদকে আরো উদার, রসিক ও গতিশীল করে তুলুক। ধর্মীয় গোঁড়ামি, ধর্ম-উদাসীনতা ও যুদ্ধাপরাধী বর্তমানের মুখোমুখি দাঁড়াবার প্রেরণা আমার এই 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধসঙ্গীত' থেকেই পেতে পারি। বাউলরা আমাদের উৎস-চেতনার অন্যতম আধার। এই মৃতপ্রায় মহানগরীতে বিপর্য্যস্ত আত্মাবিচ্ছিন্ন মানুষের প্রতি তাঁদের দায়িত্বও কম নয়। আশা করি তাঁরা এই ব্রতে অটল থাকবেন। জয়গুরু। ■

Bangla Kounterkulture Archive | curation Q | Surojit | Sucheta volunteers Suman | Avishek

ভাদ্র ১৪২২ ● অগাস্ট ২০১৫

৩. টেবিল দূরের সন্ধ্যা

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতি

সে এখন ভুলে গেছে, তাড়ি খেতে সে এসেছে বাঁকুড়ার রাঙামাটি পথে।
মদ, মদ, ঘোর গাঁজা, পোড়ামাটি-আকাশে ছড়ানো মদরং
পশ্চিমী গরম হাওয়া, শুধু এর মধ্যে কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়েছে

বাইরে—গাড়ি না, লোক; যে সব পুরুষ দেখতে আর কখনো সুন্দর হবেনা
তাদেরই মুখের মতো গাড়ি, অথবা গাড়িরা দেখতে তাদেরই মুখের মতো—
সমাধান প্রায় অসম্ভব, সমাধান হয়, তাড়িবেচা কিশোরীকে দেখো,
ও যে সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলো মরা-খড়ে ছাওয়া হেলে পড়া বাড়ি

বাড়ির ভিতরে গাড়ি চলে, খাকি ও সুরকি ওড়ে, খশে লালমাটি
উল্টেপড়া পান্তাভাতে পেঁয়াজ চকচক করে, লণ্ঠনের আলো
কিশোরীর মুখে বমি নেশাভরা বসন্তরোদের মতো লালচে করেছে

গাড়িদের আওয়াজের মধ্যে পশ্চিমী তুখোড় খিস্তি, জয়ধ্বনি,
জানালার ফাঁক দিয়ে যে সমস্ত গাছ দেখা যায় তারা সকলে শিমূল
শিমূলডালের মতো কিশোরীর উরু সরে যায়, জয়হ্রেষা,

এ বছর কোনো বৃষ্টি নেই, কোনো বছরেই কোনো বৃষ্টি নেই,
ঘামতে ঘামতে তার নেশা নেমে যায়, বোঝে, সে রয়েছে পশ্চিমবাংলায়
যেখানে পল্লব নেই, শুধু আত্মহত্যার রাঙা, রাঙা ভয় আছে

১৯৭৯

বন্ধু

আমরা তার ঘরে এলাম। বাইরে তার সাইকেল দাঁড় করানো। ঘরে
বিদ্যাসাগর আর ব্রুসলীর ছবি, বুকর‍্যাকে আইন, হিসাবশাস্ত্র,
প্রবন্ধ, পদার্থবিদ্যা, কবিতার বই—মাঝখানে একটা দুটো পর্ণোগ্রাফি।
র‍্যাকের নীচেই মুগুর, বুলওয়ার্কার, তাস আর ঘুড়ি
বালিশের তলায় কণ্ডোম, টাকা, চাবি, একটা প্যাকেটে
সিদ্ধি, খাটের তলায় কল্কে, এককোণে একটা মদের বোতল;
টেবিলে ডায়েরি আমরা খুলে দেখলাম, বেশ কিছু হিসেব, ব্যক্তিনাম,
দু-একটা ঘটনা লেখা—'আজ এতো জ্যোৎস্না ছিল যে ওসব কিছু
ইচ্ছে করেনি' 'মেয়েটা এতো বাচ্চা আমি বুঝছি কিন্তু গরম হয়ে
যাচ্ছি' 'আজ মনে হলো ঈশ্বর সত্যি আছে' 'আজ বুঝলাম
ভগবান ফগবান ফাঁকি' 'জাহাজে ক'রে বাইরে যাবো'
ড্রয়ারের মধ্যে একটা প্যাকেটে তার পাসপোর্ট সাইজের ছবি
যা পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় লেগেছিল। ছবিতেই
দেখা গেল তার একসারসাইজ করা চোয়াড়ে চোয়াল আর
ধূমপানে বসে যাওয়া গাল

এসব আমরা আগে দেখিনি। এখন দেখেছি, কেননা সে
মৃত্যু, কিংবা অন্য কোনো কাজে ঠিক এসময় আমাদের মধ্যে নেই

১৯৮১

শক্তি

মাঠটি উদাসী, ছোটোখাটো জলা ঘাস, মাটিতে কখনো চিড়
একপ্রান্তে ছোটো বন, ঝুপসি পাতার অন্ধকার, দু একটা পোকা . . .
আমি ওই দিকে যাবো, মাঠ আমার পক্ষে বড়ো বেশি, এই মাঠে
আকাশের দিকে চেয়ে যদি সব নির্মোক খসিয়ে শুয়ে থাকি
তাহলেও কেউ আসবে না! বরং বনের দিকে যাই,
ওখানে রোমাঞ্চ নেই, অরণ্যে রোমাঞ্চ থাকে, ওখানে বিলাপ
খুব ক্ষীণ, নিরক্ষর তান্ত্রিকেরা ওইখানে আসে।

ও কার কালো পা? এতো মানিয়েছে
যে, কোনো শব্দ করতে রুচি হয় না। মিশে গেলো এইমাত্র।
হয়তো পুরাণপ্রিয় এই মন বন্য কালীকে দেখলো।

আর কিছুক্ষণ পর মাঠ নেই, পাতা, ডাল, শিকড়, শব্দেরা
ছোটোখাটো—ওদিকে বোধহয় কোনো মাঠ, যাই হোক, যেতে হবে,
মাঠের রোমাঞ্চে বেশ সময় কাটলো, এবার ধরতে হবে বাস
ছোটো নালামতো, তা-ও পার হওয়া গেলো

সে খাচ্ছে, যেভাবে
সারাদিন রোদে খেটে-আসা নারী খায়; যদিও সে
খাচ্ছে রক্ত, মুখে কোনো শোক বা আনন্দ নেই, দিব্যতা-ও নেই
নালার এপাশে ব'সে ক্ষুন্নিবারণের জন্যে স্পৃহাহীন মুখে
রক্ত খেয়ে যাচ্ছে। একবার আমাকে দেখালো।

বাসগুমটির কাছে এসে আমিও চা খেয়ে নিই এরপর।

১৯৮২

কবি

মহাস্থবির জাতক যিনি লিখেছিলেন তাঁর শেষজীবনের বাড়ির সামনে রাধাকৃষ্ণের মন্দির ছিলো। মাঝখানে রাস্তা, সেই রাস্তায় প্রথম দুমুখো সাপ দেখি সাপুড়ের কাছে। সাপুড়ে হেসে বলেছিল—এ সাপ তেড়ে গিয়ে কাটতে পারে না কাউকে।

হতবুদ্ধির চোখে সাপ দেখেছিলাম সেদিন, আজ যেমন নিজেকে দেখি। আজ ঐ রাস্তা দিয়েই রোজ আমাকে যেতে হয়। দুমুখো সাপের জীবন আজ আমারই, আজ আমি জেনে গিয়েছি আমার বিষ না কামালেও বিধাতার চলে যায়। হয়তো নিজের বিষে নিজেই মরে যাবো একসময়, ভয় হয়, যদি আত্মা থাকে, পুনর্জন্ম থাকে, যদি পুনর্জন্ম নিতে এমনই কাড়াকাড়ি পড়ে আত্মাদের মধ্যে—কী হবে আমার। তবু মৃত্যুময়ূরের রূপ মনে প'ড়ে কিছুটা আহ্লাদ হয়—নিশ্চয় সে একদিন উর্দ্ধে তুলে নেবে। সেসময় তাকে কি বলতে পারবো ....., তোমারও যে মৃত্যু, সেই আশ্চর্য চিতাবাঘের পায়ে জড়িয়ে গিয়ে—কামড়াতে পারিনি—কিন্তু দৌড় করিয়েছিলাম তাকে দিগন্তের পর দিগন্ত, থামিয়ে রেখে ছিলাম তাকে স্তব্ধতায়, নিজেরই চারপাশে ঘুরপাক খাইয়েছিলাম তাকে নির্জনে! এর বেশি কিছু করার ছিল না আমার—যাকে ব্যর্থ বললেও অন্যান্য ব্যর্থদের অবমাননা করা হয় আমি ছিলাম সেই দুমুখো সাপ!

১০.৮.৮২

বাল্যকালের প্রথম বেশ্যা

ভোর চারটে, উত্তর কলকাতার সবুজ লাইটপোস্ট তখনো জ্বলছে, রিক্‌শায় আমি-মা-বাবা, মিনার্ভা থিয়েটারের পাশের গলিতে রিক্‌শা এসেছে, আমরা চলেছি গঙ্গাস্নানে—হঠাৎ সে, সেই আলুলকুন্তলা বিস্তীর্ণসিঁদুর নক্‌শাপেড়ে শাড়ি পলার-রুলি সোনার বালা একবার তীব্র চোখে তাকিয়ে দুর্ঘটনার মতো ভেঙে পড়লো রিক্‌শার পাদানির ওপর। মা একবার দেখে চোখ বন্ধ করে ফেললো, রিক্‌শাওলাটা চ্যাঁচাতে শুরু করলো, বাবা কি বলে উঠলো শুনতে পেলাম না, সমস্ত শরীর দিয়ে তখন একটা শব্দ উঠছে নামছে, এ-এ বেশ্যা, এ-ই বেশ্যা! 'আরে এ রাণ্ডি, হট্!'

'না গো, যাবো না-আ, যাবো না-আ, আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো—আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো!' মদপেঁয়াজের অতিপার্থিব গন্ধ মিশিয়ে, সে এই কথা কটি বারবার বলতে থাকে। তাকে ঠেলে সরিয়ে রিক্‌শা ভোরের নদীর দিকে এগিয়ে যায়, আর ধাক্কা সামলে নিয়ে সে একটা নোনা দেওয়ালে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়ায়—সেই শেষ-নিশির নারী তার চুলের কালো বিদ্যুৎপুঞ্জ দুলিয়ে চীৎকার করতে থাকে: 'ইঃ ইঃ, আমাকে বাড়ি নিয়ে যাবেন!! স্যোন্, বাড়ি আমি যাবো না! আমি এখানে র‍্যালা করবো—বুঝলি-ই-ই?'

কেউ জবাব দেয় না। সহসা সমস্ত দিক নিঝঝুম হয়ে আসে। কান খাড়া ক'রে আমি শুনি, সে নিরভিনয় ভাষায় বলে ঃ বাড়ি আমি যাবো না।

১৯৭৭

বন্ধুদের

তেমন চোখের জল আমার ছিলো না কোনোদিন
জলের ভিতরে চোখ ভেসে গিয়েছিল
জলের ভিতরে চোখ বহে গিয়েছিল,

জলের ভিতরে চোখ বাষ্প হয়ে শূন্যে উঠে মেঘ হয়েছিল

জল সব দ্যাখে, এই জেনে। আমার আগুন আছে, অন্ধের আগুন
ধ'রে আছে জিভ-কণ্ঠা-হাত-উর্দ্ধবুক।
আগে, তা নিভুক।

৪.৫.৮২

নৈশ

রাত প্রায় দশটা, পাথর এখনো তেতে আছে

মড়া পুড়ছে যমুনার ধারে

শানের ওপরে ব'সে পুরুষযৌবন, গাঁজা হাতে, পাশেই মিঠাই

পাশে খোদা, মুহব্বত, বদ্‌লা নেওয়া, ঘানি

নদীর দুদিকে ফ'লে আছে অন্ধকার অনেক তরমুজ

মড়া পুড়ছে, দুএকটা ফুলকি উঠছে, পুড়ে যাচ্ছে একসেকেণ্ড আগের সংসার

ফুলকি উঠছে, কাছেই তাজমহল, আর

যমুনার ধারে ধারে ফ'লে আছে আঁধারের অনেক তরমুজ

১৯৭৯

নিয়তি-নিশীথ

আভ্যন্তরীণ তেল, ডুবোপাথরের
আক্রমণে ছুটে চলে জল;
ঘোলা, উন্মাদনায় সেই পীড়িত নিশীথ
স্বপ্নের আপৎ-ধর্ম, আজানের অন্তর্গত অন্যমনস্কতা।

৯.৮.৮৩

মধ্যমা

কনিষ্ঠা, অনামিকার মতো
মধ্যমা প্রণয়মূঢ় নয়, নয় বুড়ো আঙুলের
মতো তির্যক ব্যক্তিতা, তর্জনীর তারাপ্রীতি
নেই তার, এজন্যে সে নেতা,
সাপের একাগ্র খিদে তাকে সব থেকে দীর্ঘ করেছে;
সাপের পুরাণ তাকে মন্থনের মন্ত্রণা দিয়েছে;
কিন্তু মানবের রাশিচক্রের আঙুল
গতিবৃত্ত মেনে, তাকে, পাশে ও নীচে-ও পাঠিয়েছে।

৯.৮.৮৩

কর্মের শব্দ

গৃহডাকিনীর জিহ্বা, শিশুর উলঙ্গতা আর
ফলের নির্বাক অম্ল থেকে, আলো ঋণ নিয়েছিল;
ঋণ নিয়েছিল কিন্তু ফেরৎ দেবে না;
আলো তাই কর্তৃবাচ্য, শুধু তার ক্ষীণ অনুতাপ, অবসর
নাতিশীতোষ্ণতা পেলে সময়, প্রাণিকুলের
মধ্যদেশে-থাকা শুক্রের অব্যয় সরস্বতীটির
কাছে আসে, এই দৃশ্যে প্রেতলোক সন্তুষ্ট হয়েছে;
কেননা কলসী, বাঁশ ভূতলে গড়ায়,
স্রোতগুলি আবাহনে মদপান করে, আর বিসর্জনের সিদ্ধিতে
কোথাও নিজেই ডোবে তারা ঃ পৃথিবী-ইথারে
চাল ফুটবার মুগ্ধ শব্দ লেগে থাকে।

১৩.৮.৮৩

প্রকৃতি

মলিনা এই সংসার, এর কারখানাগুলি ধূমাবতী;
মৃতদের সূক্ষ্ম আক্রোশ
এখানে যুবকদের আরো প্রগল্‌ভ করেছে;
প্রগল্‌ভতার সেই সবুজ পল্লবগুচ্ছে
সূর্য উঠলে সরষের তেল লাগে, সঙ্গে-সঙ্গে
বহির্দেশের এক কিংবদন্তী-বাঁশি
তাকে-ও সুনীচ করে, অথবা গভীর।

৯.৮.৮৩

নির্ণয়

মাটি তো তেমন নেই, কিন্তু ভূমি আছে;
পশুর মতন প্রিয় লোকজন, কবিতা রচনা।
আলোই ক্লান্তির যজমান ব'লে
আলো মাঠ, ধ'রে নিতে হয়।
মাটি, এখনো বাঙ্ময় ততো নয়—
ধুলোবালি, ভাবপ্রবণতা
এসব রয়েছে তার; মাঠে পশু গেলে
আকাশে তখন দৃষ্টি যায়; নির্ণয়েচ্ছু সেই পলায়ন।

৯.৮.৮৩

সকাল সাড়ে নটায়

অনবরতই তুমি পালাচ্ছিলে যেভাবে বেড়াল পালায় বালকের কাছ থেকে কার্ণিশের পর কার্ণিশ টপকে—এমন কি খবরের কাগজেও তুমি এক কবির মৃত্যু উপলক্ষে চিঠি ছাপানোর সামাজিক দায়িত্ব ধরে ফেলতে চেয়েছো। দাঁত মাজোনি অনেকদিন যাতে দাঁতের যন্ত্রণা হয়। ভাবোনি প্রত্যেক বাড়িতে একই বালক। আজ খরার পর বৃষ্টি নেমেছে—পৃথিবীতে যেরকম হয়। তোমার মনে পড়ছে বাচ্চাবেলায় পড়া সেই ওয়েস্ট ওয়ার্ড হো, সেই বৃষ্টি-হাওয়া-ঝড়-সাগরের মধ্যে টালমাটাল জাহাজ যেখানে প্রেমিকদের পুড়িয়ে মেরে ভাবা হচ্ছে হয়তো নিরাপদ হওয়া যাবে। তোমার স্কুলের বই ছিলো 'পৃথিবীর পরিচয়', যার মলাটে সমুদ্রের ছবি কিন্তু বালুকাবেলা ছিলো না কোথাও। আজ খরার পর বৃষ্টি নেমেছে, আজ বিপর্যস্ত সাড়ে বত্রিশ বছরে তুমি মেনে নিচ্ছ অনন্তে সমস্ত এক, গোলাপ, আগুন, কাদা, ধূপ, অভ্র ও মরিচা সবই। একটু বাদেই তুমি লাফিয়ে উঠবে অফিসের দিকে, অর্থাৎ, আবার পালাবে, দুর্ভাগ্যের জন্যে খেদ নিয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে ব'সে থাকবে—কেননা যে কোনো বন্ধুযুগলের মতোই, আমাদের মতের মিল খুব কম সময়ে হয়েছে। বেড়ালের মতোই একদিন নির্জনে সবাইকে ছেড়ে দিয়ে তুমি মরে থাকবে, আমার এই শুভেচ্ছা রইল। সমুদ্র সেদিন তোমার থেকে চার পা দূরে থাকবে, তুমি বালুকাবেলায়, পৃথিবীর পরিচয়ের একেবারে প্রান্তে। যাও, পালাও এখন . . .

২৮.৭.৮২

কেন যামিনী

সবটাই জৈবতা এমন ধরতে অসুবিধে হয়। পঁচিশ/ছয়/পঁচাত্তরের রাত মনে পড়ে—সে বেশ রাজনৈতিক রাত, সে এক ফেমিনিন ইমারজেন্স, তবু সাড়ে এগারোটায় আলো নেভাতে, একটু বাদেই লম্বা অনঙ্গযন্ত্রণা। গৌতম, তখন তৈরি হওয়া গিয়েছিল সুনির্দিষ্ট কামপ্রবণ জীবনযাপনের জন্যে—যা-ই করি না কেন, কিছু যুক্তি—কিছু উন্মাদনা তো সংগ্রহ করে নিতে-ই হয়। দিন তিনচার বাদে প্রেত এবার কামড় দেয় বুকে, গলার কাছাকাছি। প্রেম আসে, গরম জলের মতো টগবগ করে প্রেম ফোটে, যে প্রেম গরাদ ধরে চাঁদ, আকাশ মেঘ দেখার পক্ষপাতী, যে প্রেম বাতাসের বীজন চায়, গান চায়। কয়েক ঘণ্টা বাদেই শূন্যতা। আবার হঠাৎ একদিন মূলাধারে কামড়ায় প্রেত, দুধ গরম হয়, যে গরম শুধু দরজা বন্ধ ক'রে দিতে চায়, ততোটা বাতাসপ্রিয় নয়, গান চায় না সেই উথলে ওঠা লাল ঘনশ্বাস। সবটাই মনের কথা, হয়তো হর্মোনেরও, তবু গৌতম, প্রেতের কামড় আমি টের পেয়েছি। রাত প্রেত নামায়। রাত আমাদের নিয়ে কী করতে চায় তুমি জানো গৌতম? সহবাসের ভিতর দিয়ে সবসময়েই দেখেছি যে লিপ্ত হচ্ছে সে প্রেত, ইয়ার্কিবাজ অথবা আর্ত, সে আমরা নই। হাওয়ার থেকে বেশি পাষাণ আমি দেখিনি।

১১.৭.৮২

বিরহ

মাঝে মাঝে আমাকে বেপাড়ায় দেখা যায়। বলা দরকার যে পুরুষদের বেশ্যাগমনে যেহেতু সমাজের মৌন সমর্থন আছে, সেই কারণে, এই অঞ্চলকে আমার নিষিদ্ধ মনে হয়নি; এছাড়াও, অভাবীদের সঙ্গে যৌনতা হয় না—খ্যাতিহীন কবিদের স্ত্রীরা প্রায়ই যা বুঝে ওঠেন। তা-ও, আমাকে এই মৌন পল্লীতে বা সংলগ্ন এলাকায় দেখা যায়।

মাঝে মাঝে দুটি একটি স্বভাবী রমণী এসব পাড়ায় আসে। একবার একজনের খবর পেয়েছিলাম, আর দশটি ভিন্নভিন্ন রাজনৈতিক দলের সক্রিয় যুবকর্মীদের পাঠিয়েছিলাম তার কাছে। পরে নিজে তার কাছে যাই। সেদিন দুপুরে খুব বৃষ্টি। খুব জেদ নিয়ে জানতে চাই—শুধু জানতে চেয়েছিলাম দশজনের তফাৎ কী কী। কে কীভাবে। কিন্তু, সে এমনি ধূর্ত যে খালি সঙ্গম করতে চায়। প্রায় দেড়ঘণ্টা কাটিয়ে কথা না বার করতে পেরে উঠে আসি। চা খেয়ে ধাতস্থ হয়ে আঁচ করি যে ওসব করলে হয়তো তারপর জানা যেতো—যদিও, লিপ্ত হ'লে জানতে ইচ্ছে না-ও করতে পারতো, সে সম্ভাবনা-ও ছিলো।

আমি পরে তাকে পাইনি, জায়গা বদলেছে। কিন্তু তারই মতো কাউকে আমি খুঁজছি—আরিয়াডনে, তোমার কাছ থেকে ঐ উলসুতো না পেয়ে ভারতবর্ষের গভীরে যাবার মতো পুত্রতান্ত্রিক আমি নই, আরিয়াডনে, যদি দেখা না দাও, সুতো না দাও, আমি এই জীবন নিম্নরাজনৈতিকতার সিন্ধুবালির গর্তে থেকে যাবো।

২৮.৫.৮২

আরো রাতের কবিতা

বাঁশঝাড় পাশে রেখে, লরী ও মোটর যায় তারাদের দিকে
ড্রাইভার জানালায় এসে দেখে, কোথায় রয়েছে ছায়াপথ

তার
ধীর হাসি; বহু বছরের চাকরির ইস্তফা জমা দিয়ে
মানুষ যেমন হাসে। মনে পড়ে, জল নিতে হবে। কাছাকাছি
পুকুর আছেই।

বাঁশঝাড় পাশে রেখে, লরী ও মোটর যায় তারাদের দিকে
পুকুরে তারার ছায়া, কোথাও যাবে না!

১৯৭৮

টেবিল

টেবিল, দূরের সন্ধ্যা

ঘনিয়ে আসছে। ফল, মৃতদেহ
অফিসফাইল, জোড়া-খোয়া দুল
নেগেটিভ প্রিন্ট, অ্যালবাম, প্যাড

কি রাখবো তোমার উপর?

চেয়ার, রাখতে হবে সামান্য সরিয়ে

২০.৮.৮২

প্রকাশকাল : ফাল্গুন ১৩৯০ —মার্চ ১৯৮৩

ODDJOINT # বাংলাব্ল্যাক

Bangla Kounterkulture Archive | curation Q | Surojit | Sucheta volunteers Suman | Avishek

ভাদ্র ১৪২২ ● অগাস্ট ২০১৫

৪. কেউ খেলোয়াড়, কেউ ফেলোয়াড় নবারুণ ভট্টাচার্য

আমাদের সময়ে নিঃস্ববিদ্যালয়ের কবিতা শিখতে হত। মৃত কবিদের ভূত এসে ভয় দেখাত, বিদঘুটে সব ছন্দে কবিতা না লিখতে পারলে পিঠে কিল মারত, কোনো ছাঁচ বা আদল নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে তর্ক থেকে হাতাহাতি শুরু হলে নিজেদের এক একটি মোক্ষম কবিতা সাইক্লো করে ঘুমের মধ্যে পাঠিয়ে দিত। ভাগ্যে তখনও জেরক্স চালু হয়নি। কবিতার থিওরি-তে যার সিদ্ধহস্ত তারা রোয়াব নিয়ে বলত, 'প্রিন্সটন এনসাইক্লোপিডিয়া অফ পোয়েট্রি অ্যান্ড পোয়েটিক্স' পড়েছ? নিঃস্ববিদ্যালয়ে অত দামি বই পাওয়া যেত না। অতএব আমি প্রতিটি পরীক্ষাতেই ফেল করতাম। তাছাড়া তখন রেওয়াজ ছিল জ্বলন্ত ইয়োইয়ো-র খেলা দেখিয়ে বিপদ ডেকে আনা। তার সঙ্গে নানারকম বাজির ভাগ বিষয়ক অঙ্ক কষা, পেট্রল ভরা স্বচ্ছ লাইটার থেকে সিগারেটের সলতে ধরানো, ফানুসের টানে ভাসানে যাওয়া—এ সব তো ছিলই। আর একটা মজাও আছে। ফেলের ভয়টা চলে যায়। একই উপায়ে, অন্য ধান্দায় লামারা শিক্ষালাভ করে শীতের ভয় ভুলে যায়। ধীবররা সাইক্লোনের। ধীবর, লামা ও কবি কেন, এমনকি মশা ও টনি ব্লেয়ার, কেঁচো ও কুশাভাউ ঠাকরে—সকলেই মৃত নক্ষত্রচূর্ণ দ্বারা নির্মিত! সবকটা হাইজ্যাকারও তাই। অতএব নাম না করলেও রাখঢাক নয়।

ফেল করা কবিদের হ্যাটা হওয়াটা কোনো নতুন ব্যাপার নয়। এরকম হয়েই থাকে। সেরকমই একটি ঘটনা। সাহস করে একবার একটা ভিলানেল লিখে ফেলেছিলাম। এবং তাও বাংলায় তা কেমন দাঁড়ায় তার কোনো মডেল বিনাই। সেটি পড়ে লোকান্তরিত এক মহাকবি বলেছিলেন, "দুঃখের বিষয় ওটা ভিলানেল হয়নি"। কথাটি তিনি সরাসরি আমাকে বলেননি। বরং চাটুকারে পরিবৃত্ত তাঁর সন্ধ্যাসভায় ব্যাপারটি নিয়ে উপহাস করেছিলেন। মজাটা হচ্ছে যে আমার জঘন্য ভিলানেলে শেষের মিল ঠিকই ছিল—গোলমালটা হয়েছিল ফরাসি মডেল দেখার জন্যে, মানে চোখে দেখার জন্যে—কারণ ভাষা না জানলে ডাবল রাইম গুলিয়ে যেতেই পারে। অর্থাৎ কড়া গণিতের হিসাবেও আমারটা অন্তত 'ভিলানেল ভাজিত দুই'—কিন্তু কবিতা কি পাটিগণিত বা বেতোজমিদারের পেয়ারা বাগান? বলাই বাহুল্য ঘটনাটিতে কচি ফেলোয়াড় যথেষ্ট আহত বোধ করে। এরকম না করে তিনি তো ডেকেও বলতে পারতেন। আরে বাবা, প্রায় নাম করেই বলা যেতে পারে এরকম দুজনের মতো লরকা-র 'দেসপেদিদা' বা এন্‌জেনস্‌বারজারের 'মিডল ক্লাস ব্লুজ' নিজের বলে তো চালাইনি বা কারো কবিতা ছেনতাইও করিনি। এই মহাকবিকেই দেখেছিলাম এক সন্ধ্যায় বুদ্ধদেব বসুর কবিতা নিয়ে নিরন্তর ঠাট্টা-মশকরা করতে। তার পরদিনই অফিসে ঢুকতেই সিদ্ধেশ্বর সেনের মুখে শুনলাম বুদ্ধদেব বসু মারা গেছেন। আমি বুদ্ধদেব বসুর ভক্ত নই, চিনতামও না। কিন্তু ওই মহাকবির আর কখনো মুখদর্শন করিনি। এনার উন্নাসিকতা এমনই ছিল যে বাগবাজারে থাকলে বাগনানে নাকের ছায়া পড়ত। অথচ দেশ ও বিদেশের অনেক প্রবাদপ্রতিম কবির সঙ্গে আলাপ হয়েছে এবং ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, ফিরাক গোরখপুরি বা আলি সরদার জাফরি-র মতো কবিও সম্পূর্ণ অপরিচিত এই তৎকালীন বালককে যথেষ্ট সময় দিয়েছেন। তাই বেশি দাম্ভিক, পণ্ডিতম্মন্য ও চামচা-ঘেরা কবিদের আমি এড়িয়ে চলাই রুচিসম্মত বলে মনে করি।

ফেল করা কবিদের কোনো কোনো সকাল অলৌকিক হয়ে ওঠে। সেরকমই এক সকালে, তখন আটটাও বাজেনি, বেকার এই কবিকে ঘুম থেকে দরজা ধাক্কে তুলেছিলেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

অথচ দেশ ও বিদেশের অনেক প্রবাদপ্রতিম কবির সঙ্গে আলাপ হয়েছে এবং ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, ফিরাক গোরখপুরি বা আলি সরদার জাফরি-র মতো কবিও সম্পূর্ণ অপরিচিত এই তৎকালীন বালককে যথেষ্ট সময় দিয়েছেন। তাই বেশি দাম্ভিক, পণ্ডিতম্মন্য ও চামচা-ঘেরা কবিদের আমি এড়িয়ে চলাই রুচিসম্মত বলে মনে করি।

সারা ঘরে ছড়ানো কাগজ ঘেঁটে দুখানি কবিতা বেছে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর সম্পাদিত এক সংকলনের জন্যে। ভাবা যায়? এরকমই সস্নেহ স্মৃতি রয়েছে অরুণ মিত্রের, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের। ঘটনাচক্রে আমি বরাবরই পদ্য ও গদ্য লেখার বৃথা চেষ্টা গোড়া থেকেই করে আসছি। আমার প্রথম গল্প ছেপেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, 'পরিচয়'তে। গল্পটির নামটি পাল্টে দিয়েছিলেন—'অর্কেস্ট্রা' ছিল—উনি করলেন 'ভাসান'। বলাই বাহুল্য যে, গল্পের নাম দেওয়ার শিক্ষার ওই গুরু। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞাপন দিলেন যে অসীম রায়ের সঙ্গে আমারও একটি 'অসাধারণ' গল্প প্রকাশিত হতে চলেছে। তখন আমায় দেখে কে? এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসি পড়াতেন অরুণ মিত্র। কবিতার দুনিয়ায় যে ভিসা, পাসপোর্ট লাগে না সেটা তাঁর কাছেই জানতে শুরু করি। ইয়েভগেনি ইয়েভতুশেঙ্কো-র আত্মজীবনী, এলিয়ট কৃত পের্স-এর অনুবাদ (সিমার্কস—আমেরস) এলুয়ার, সুপেরভিয়েল। অনেক কিছু তিনি পড়িয়েছেন। সস্নেহ সাহচর্য পেয়েছি সিদ্ধেশ্বর সেন, চিত্ত ঘোষ, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল ও আরও অনেকের। ফেল করা কবির আর কী চাওয়ার থাকতে পারে?

এক একসময় তন্ময় হয়ে ভাবি যে কবিরা কত রকম খেলাই না দেখায়। অনন্য রায় যেমন রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের কত আগে এরোপ্লেনই শুরু বানায়নি, গ্যাগারিনের আগে মহাকাশেও গিয়েছিল। এবং সেখান থেকে আর ফেরেনি। অথবা রণ-পা পরে, রক্তবমিকে অস্বীকার করে বিদ্যুৎ চুল্লির ভেতরে কী আছে দেখতে চলে গেলেন সমীর রায়। আপাতত অশিক্ষিত ন্যাকামি, ছদ্ম দর্শন ও ধান্দাবাজি মিলেমিশে বাংলা কবিতায় এক বিচিত্র ভাইরাস হয়ে দেখা দিয়েছে এবং এই জালি কবিতার প্রোমোটারও জুটেছে বিস্তর। সরকারি ও বেসরকারি। খুব বাজে লাগে। এসব নিয়ে ভাবতে ঘেন্না হয়। এর সঙ্গে একমাত্র তুলনীয় হল মড়াদের ফ্যাশন প্যারেড। এই তুলনাটাই ফেল করা মাথায় এল। ■

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০০১

Bangla Kounterkulture Archive | curation Q | Surojit | Sucheta volunteers Suman | Avishek

ভাদ্র ১৪২২ ● অগাস্ট ২০১৫

৫. বাজেশিবপুরে নবারুণ সুচেতা ঘোষাল

আমার বাবার ছোটোকাকা ইস্কুলের কোনও এক হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষাটা ডুব মেরেছিলেন শুধুমাত্র এই বিশ্বাস নিয়েই যে, বিপ্লব যখন এসেই যাচ্ছে তখন আর কীসের ইস্কুল, কী-ই বা পরীক্ষা। ৪৮-এর সেই গনগনে দিনকালে তখন উচ্চারিত হয়েছে, ‘‘ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়’’, আমার ঠাকুরদা তখন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য হিসেবে জেল খাটছেন। এরই মধ্যে ডাক উঠল জেলের পাঁচিল ভাঙার —অর্থাৎ বিপ্লব প্রায় বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়ছে, এরপর কোন আহাম্মক শেরশাহের বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে টীকা লিখে কৈশোর নষ্ট করে! কিন্তু দোর খুলতেই দেখা গেলো, রক্তে বিপ্লবের মাত্রা যতখানি তুঙ্গে, রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্ষমতা ও জহরকোটের শুভ্রতায় তার প্রভাব ততখানি নয়। এইসব, সমস্তই, আমার শোনা কথা আর পড়া, ছাপা অক্ষর থেকে।

গ্রাফিতি: সম্বরণ দাস

কী জানি, হয়তো সেই থেকেই কখনো খুব ছোটো বয়সেও হাড় হিম করা সব ভূতের গল্প আমার কাছে বিশেষ রোমাঞ্চের ঠেকেনি। তবে এইসব গল্পের আড়ালে আমার প্রশ্নটা থেকেই যেত, তাহলে এবারেও বিপ্লবটা হলো না, ৪৮-এ না, ৬৭ তে না, ৭১-এও না? দাদাই বলেছে, ‘‘হবে’’। আমার প্রশ্ন আমি উচ্চারণ করিনি কখনোই, দাদাইয়ের উত্তরও ছিল সাংকেতিক। তাই অভ্যাস থেকেই বলছি, শুনে নিন, ৩০ জুলাই ২০১৫তে বাজেশিবপুরে যুবক সমিতির কর্মকাণ্ড সংকেত দিয়েছে, ‘‘হবে’’।

জুন মাসের মাঝামাঝি ঠিক করা হয়েছিল, জুলাই মাসের ৩০ তারিখে নবারুণের উপর বানানো কিউয়ের ডকুমেন্টারির একটা স্ক্রিনিং ঘটবে হাওড়ার বাজেশিবপুরে যুবক সমিতির ক্লাবের ঘরে। ছবিটির অনেক অংশই বাজেশিবপুরে শ্যুট করা আর তার থেকেও প্রয়োজনীয় উপাদান হলো, এই পাড়ার মানুষেরা, যাঁরা না থাকলে ছবিটা হয়তো হতই না। কাজেই কিউয়ের এই ছবি হাওড়াতে দেখানো একরকমের ফিরে আসা —অবলম্বনের কাছে, বন্ধুত্বের কাছে। শুধু তাই নয়, কিউয়ের সঙ্গে বাজেশিবপুরের সম্পর্ক সেই ‘গান্ডু’ তৈরির সময় থেকে। বাজেশিবপুর না থাকলে এই বিপ্লবী আন্ডারগ্রাউন্ড ফিল্মটি তৈরিই হত না। যে ফিল্ম বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল কমিটির মন জয় করেছিল আর সেই সূত্রে পৃথিবীর আরও ৩০টি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল কমিটিরও।

এর আগে হাওড়ার সাথে আমার পরিচয় ছিল না বললেই চলে। কয়েক সপ্তাহ আগে তখন ৩০ তারিখের তোড়জোড় সবে শুরু, হাওড়াও তখন থেকেই জানান দিতে শুরু করে। কিন্তু কী আশ্চর্য, বেশ কিছু সন্ধ্যেবেলা, বেশ কিছু বলতেই আমার মনে হয়েছে যেন কোনো এক সূত্র ধরে চেনা। এ ভারি মজার ব্যাপার, চন্দননগরের যে বস্তি অঞ্চলের সাথে মাখামাখি দিয়ে আমার বড়ো হয়ে ওঠা সেই ঝুপড়ি ঘরগুলোর অনেকগুলোতেই এখনও সহজ পাঠও প্রবেশ করেনি, ইলেক্ট্রিসিটিই ঢুকেছে এই হালে। সুতরাং নবারুণ ভট্টাচার্য ও তার উপস্থিতি সেখানে ভীষণই অকিঞ্চিৎকর এক ঘটনা। কিন্তু ক্লাস সিক্স কি সেভেনে যখন পড়ছি, তখন হার্বার্ট হাতে নিয়ে দেখলাম অদ্ভুত চেনা চেনা ঠেকছে। বস্তুতই আমার জ্ঞানে ততদিনে যেটুকু খিস্তির সমারোহ সমস্তই ইমিডিয়েট পারিপার্শ্বিক থেকে যত্নে ও অযত্নে সংগৃহীত। এই নিয়ে অনেক কথা বলা যায়, তবে যেটুকু বলার, আমি নবারুণকে চিনেছি এই চারপাশ দিয়ে, আর এই যে এতদিনের চেনা চারপাশটাকে নতুন করে আরও আরও আবিষ্কার করতে শিখেছিলাম নবারুণকে দিয়ে। আর হাওড়ার অলি গলি চিনতে শুরু করেছি খানিকটা এই এতদিনের চিনতে পারার অভ্যাস দিয়ে।

ঠিক হল, ছবিটা দেখানোর সাথে সাথেই কিছু আরও কর্মসূচি নেওয়া হবে। সম্বরণ গ্রাফিতি করবে নবারুণের কথা, কাব্য ও আরও নানান বিস্ফোরক। ল্যাম্পপোস্টের
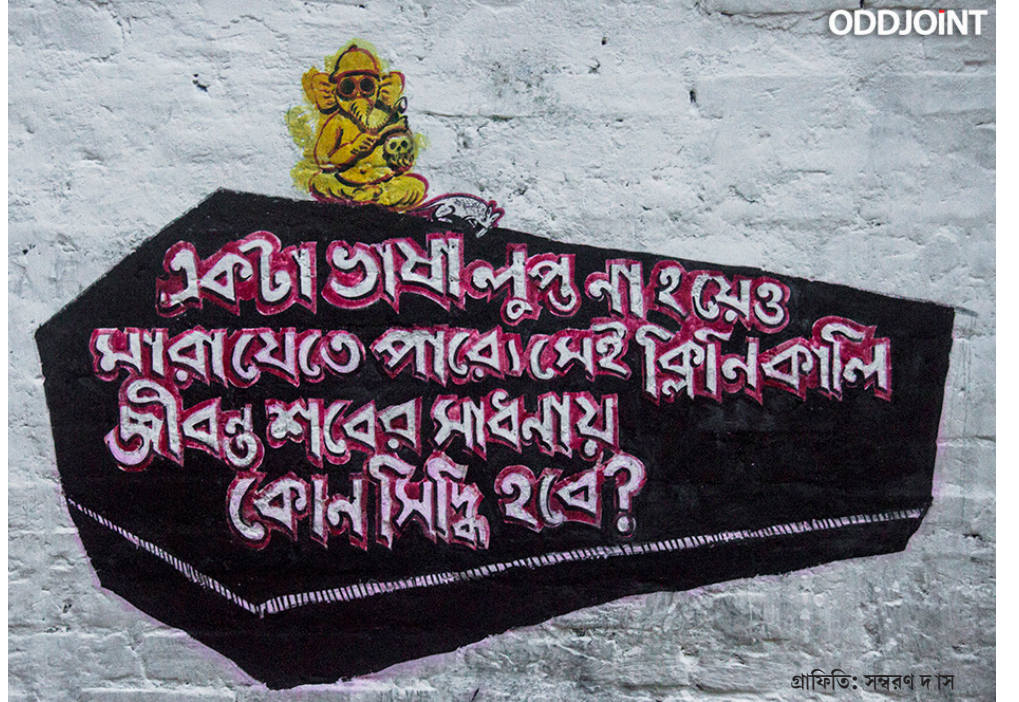
মাথায় লাগানো হবে মাইক আর তাতে নবারুণের কণ্ঠ অবিরাম বলে চলবে তাঁরই লেখা কবিতাগুলো। একটা বাড়ির দেওয়ালে প্রোজেকশন করে দেখানো হতে থাকবে বিভিন্ন স্টিল ছবি, ভিডিও লুপ। একটা বুথ তৈরি হবে, বেবি কে'র বুথ, নবারুণের শেষ প্রকাশিত উপন্যাসের নায়িকার নাম। আর টেবিলের উপর থাকবে ল্যাপটপ, হেডসেট দিয়ে শোনা যাবে বেবি কে'র কিছু অংশ পাঠ করেছে জয়রাজ আর সুরজিৎ। নিতাই ওই বুথের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবেন ঠিক হল, আমাদের মিউচুয়াল ম্যান, চোখে আবার সানগ্লাস। সৌরভ, মুনতাকিম আর শ্রেষ্ঠা দায়িত্ব নিলেন সেদিনের সমস্ত কাণ্ডকে ক্যামেরাবন্দি করার, সাউন্ড রেকর্ডিং-এর ভার নিলেন আস্থা। আমরা ঠিক করলাম মন্দিরতলা থেকে যুবক সমিতি অবধি রাস্তাটা মুড়ে দেব নবারুণের কবিতার লাইন লেখা অ্যানার্কিস্ট পোস্টারে পোস্টারে আর অ্যানার্কিস্ট ফ্ল্যাগে! ডিজাইন করবেন দেবিকা দাভে; গোল চশমা পড়া মেয়েটা বড়ো হয়েছে কিন্তু দিল্লিতে আর কলেজ ব্যাঙ্গালোরে, বাংলা জানে না। অথচ ২৮ তারিখ রিক্সায় আসতে আসতে আমাকে বলল, ''এই যে কেমন দেখো একটা পুরোনো ক্ষয়ে যাওয়া বাড়িটার পাশে একটা চকচকে ফ্ল্যাট, এইটা দেখতে পাবো না বলেই বোধহয় আর ব্যাঙ্গালোরে ফেরা গেল না।''

পোস্টার ডিজাইন: দেবিকা দভে

যুবক সমিতি বলে কোনও পাড়ার ক্লাবে একটা ছবির স্ক্রিনিং হচ্ছে এরকম কথা আর কেই বা কত শুনেছে। তেমনি আমি নিজেও যে ''যুবক সমিতি''তে ব্যক্তিগতভাবে এত সময় কাটাবো এটাও একটা চমক এই নারীবাদী মেরুদণ্ডের কাছে। ২৯ জুলাই-এ আমি যখন হাওড়া গেলাম, গিয়ে দেখলাম গুচ্ছ পোস্টার লাগানো হয়ে গিয়েছে, পছন্দের দেওয়ালগুলোতে চুনকাম শেষ, আর সম্বরণ বৃষ্টি মাথায় করে দেওয়াল লিখে ফেলেছে অনেকটাই। ওই গলিটা দিয়ে তো আগেও ঢুকেছি, ওই চায়ের দোকানের সামনেও যে আগে দাঁড়াইনি এমন তো নয়, কিন্তু তখন সামনের দেওয়া জুড়ে লেখা থাকত না, ''ভীতু মানুষের পাশ থেকে যে কবিতা সরে যায়, সেই কবিতা হল সব থেকে ভীতু।'' মাঝে মাঝে যেমন মনে হয় রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ, বেশ একটা মানানসই ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর দরকার ছিল জীবনে, এইদিন চা-টা হাতে নিয়ে সামনে তাকিয়ে ওই দেওয়ালটা দেখে ঠিক উলটো মনে হচ্ছিল। মনে হল, সব শব্দ আর আওয়াজ আর কোলাহল কিছুক্ষণের জন্য নেই, খালি দেওয়াল জুড়ে আছে কিছু অক্ষর অনেক যত্নে লেখা, আর তাকে ঘিরে পোস্টার, অ্যানার্কির জড়িয়ে আছে অর্ডারের। ঠিক এই রকম নৈঃশব্দ্যই নেমে আসে বিস্ফোরণের আগে, ঠিক এই রকম নৈঃশধ্য দিয়েই তো আমার কমরেড বলে দেন, ''হবে''।

দেওয়াল চুনকাম করে ফেলেছিলেন পালদা, নোটনদা, বাপিদা, প্ররেনাটারা মিলে রাত জেগে। জয়রাজ আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন বলে ক্লাবের এই মুখগুলোকে আমি ও'র ডাকেই ডাকতে থাকি এই ক'দিন। যা মনে হচ্ছে এই রকমই চলবেও। পুরো নামগুলো জানি না, কোনোদিন জানবো অথবা জেনে খুব উদ্ধার হবে এমন সম্ভাবনাও দেখছি না। হাওড়ার এই গলির আনাচ কানাচ থেকে আত্মীয়তা গজায়, এ কথা আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না। তবে শুধুমাত্র আত্মিক যোগ দিয়েও বৃষ্টিকে এইভাবে রুখে দিয়ে সারা রাস্তার প্রায় সমস্ত দেওয়াল পোস্টারে ভরে দেওয়া যায় না, আগের রাতটা প্রায় জেগে প্রোজেকশনের সমস্ত ব্যবস্থাটুকু অবধি অক্লান্ত খেটে যাওয়া যায় না। কমিটমেন্ট প্রয়োজন, তা রাজনীতির হোক অথবা বন্ধুত্বের।

তমোঘ্ন ২৯ তারিখ জানালেন একটা পারফর্মেন্স কন্ট্রিবিউট করতে চান এই ব্যবস্থায়। পুনা ফিল্ম ইন্সটিটিউট-এর নব কর্ণধার নিযুক্ত হয়েছেন গজেন্দ্র চৌহান, এই নিয়োগের পিছনে ভারত সরকারের যাবতীয় যুক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে চলেছে ছাত্র-ছাত্রীরা আজ বহুদিন হয়ে গেল। অথচ, ভারতীয় জনতা পার্টি তথা মোদি সরকার মেজরিটির দোহাই দিয়ে চাপিয়েই দিয়ে চলেছেন একের পর এক ঘটনা দেশের উপর। চৌহান তার একটা উদাহরণ, এবং যথেষ্ট অ্যালার্মিং-ও বটে। ৩০ তারিখ বিকেল ৫-ছয়৩০ থেকে তমোঘ্নর পোষাক বলতে ছিল গেরুয়া রঙের স্কার্ট সদৃশ যে কাপড়টা তার তিনটে অংশে আনন্দবাজারও বিরাজ করছে। তমোঘ্নর হাতে ছিল একটা বোর্ড যাতে লেখা, বড়ো বড়ো অক্ষরে, 'কিক মাই অ্যাস—তমোঘ্ন লাথি দাবি করছিলেন উপস্থিত ক্রাউডের কাছে গিয়ে, একের জনের কাছ থেকে, আর লাথিটা পড়ছিল আনন্দবাজারে, গেরুয়ায়, স্বৈরতন্ত্রে, স্বেচ্ছাচারিতায়, আর আমাদের কাপুরুষতায়। আর্তনাদ করে উঠছিলেন তমোঘ্ন ''বেবি কে''।

ছবিটা দেখানো হয়েছিল সেদিন। সন্ধ্যে হয়ে আসছিল হাওড়ার একটা পাড়ায়, আর সুমিত ঠাকুর জেম্বেতে বাদ্য তুলেছিলেন অন্ধকার নামার তালে তালে। বাপিদা হারমোনিয়ামে সুর ধরলেন, আর অরিত্রি, দেবারতি, শুভ, তিয়াসারা সুর মিলিয়ে গেয়ে উঠলেন ''হল্লা বোল''! সেদিন হাওড়ার অলিগলি থেকে শোনা গিয়েছিল, ''এখনই কবিতা লেখা যায়''। গলির বাঁকে যে বাড়ির দেওয়াল এতদিন গ্রাহ্য করার প্রয়োজন পড়েনি, তাতেই ফুটে উঠেছিল নবারুণের ছবি, নবারুণ হাসছেন, অসম্ভব সাংকেতিক সেই হাসি। অভ্যাস থেকেই বলছি, বিশ্বাস করুন, নবারুণ বলেছেন, ''হবে''। ■

৬. ''যে পিতা সন্তানের লাশ শনাক্ত করতে ভয় পায়'' . . . তমোঘ্ন হালদার

১৫ জুলাই ম্যাক্সমুলার ভবনে কিউ-এর 'নবারুণ' দেখে আসার পর যে রিভিউ অনিন্দ্য সেনগুপ্ত লেখেন, তার শেষ লাইন, ''আমি কিউ-এর নবারুণকে সমর্থন করতে চেয়েছিলাম।'' বিপরীতে, কিউ-এর নবারুণ সেই ছবিগুলোর মধ্যে একটি, যাকে আমি সমর্থন করতে চাইনি। ছবি দেখার বেশ কয়েকদিন আগেই জয়রাজ ভট্টাচার্য সাথে অনিন্দ্যর লেখা রিভিউ এবং এই ছবির সম্ভাব্য কিছু গণ্ডগোল নিয়ে সামান্য আলোচনাও হয়েছিল। বাজেশিবপুরে যখন ছবিটি দেখতে বসি, আমি আপ্রাণ চেয়েছিলাম যাতে নবারুণ-কে সমর্থন করতে না পারি। তাতে দুটো সুবিধে। প্রথমত, অনিন্দ্যদার সাথে ঝগড়া অ্যাভয়েড করা যাবে, যা খুবই স্বস্তির ব্যাপার। দ্বিতীয়ত, কিউ-কে আমি অনেকদিন ধরেই খিস্তি করতে চাইছি, কারণ আমি কাউকেই ভালোবাসতে চাই না, কিউকে তো একেবারেই না। আমি চাইনা আমার জীবনে কোনো হিরো থাকুক। তৃতীয়ত, ছবিটাকে ভিতর থেকে সমর্থন না করতে পারলে, ছবিটা নিয়ে ভালো-মন্দ লেখার কোনো প্রশ্নই ওঠে না অর্থাৎ আবারও একটি লম্বা লেখা লিখতে হয় না। লিখতে না পারাটা আনন্দের হত, কারণ ছবি নিয়ে লেখা আমার কাছে ক্রমেই অস্বস্তিজনক হয়ে উঠছে। অস্বস্তি হয় কারণ, যে লোকটা গত সপ্তাহেও বাস্টার কীটোনের কোনো ছবি দ্যাখেনি, তার ছবি নিয়ে এত বড়ো বড়ো কথা বলা সাজে না। আগে থেকেই ভেবে রেখেছিলাম, 'আসা যাওয়ার মাঝে' নিয়ে একটি শেষ লেখা লিখব, আর 'মাসান' নিয়ে একটি। কিন্তু সে সব হিসেব ভেঙে লিখতেই হচ্ছে কারণ আমি এই ছবিতে বিশ্বাস করে ফেলেছি, সমর্থন করে ফেলেছি কিউ-এর নবারুণকে। অতএব মনে হচ্ছে এটা আমার শেষের দিক থেকে তিন নম্বর লেখা যা ছবি সংক্রান্ত।

অনিন্দ্য-দা ইতিমধ্যেই লিখে ফেলেছেন, 'কিউ-এর নবারুণ তথ্যচিত্র নয়, একটি ফিকশন ছবি—ফ্যান্ডম ম্যাশাপ।' একমত। ফ্যান্ড ম্যাশাপ নিয়ে বলার আগে ফিকশনের প্রসঙ্গে কিছু কথা বলতেই হয়। এ ছবি তথ্যচিত্র হলে, মাঝখানে অন্তর্ঘাত ঘটিয়ে ঢুকে পড়ত না ফ্যাশন প্যারেডরত ফ্যাতাড়ুরা। অথবা মিউচ্যুয়াল ম্যান। নবারুণের একাধিক টেক্সটের চরিত্ররা রক্তমাংসের নবারুণের চাইতেও বেশি সাবলীল ভঙ্গিতে ঢুকে পড়ে ছবিতে, তাদের নিজস্ব দুর্বলতাসহ। দুর্বলতার মধ্যে একটি চোখে পড়ার মতো, তা হল ফ্যাতাড়ুদের ওড়ার দৃশ্য। যে কোনো মাধ্যমেই ফ্যাতাড়ুদের ওড়াকে কীভাবে দৃশ্যায়িত করা হবে তা নিয়ে একটা বেসিক খটকা নবারুণের পাঠক হিসেবে আমার আছে। ফ্যাতাড়ুদের ওড়াকে সরাসরি ওড়া হিসেবে কোনো ছবিতে দ্যাখানোই উচিত নয় বলে আমি মনে করি। কিন্তু তার বদলে কি দ্যাখানো উচিত তা আমি জানি না। সেখানে হয়তো আরো ভাবনার সুযোগ ছিল। কিন্তু এ তো কল্পনার প্রশ্ন। সমালোচনা লিখতে বসে কল্পনা নিয়ে কথা বলার সুযোগ কি থাকে? তাহলে তো সেই ক্লান্তিকর তর্কগুলোয় ফিরতে হয়, 'আসা যাওয়ার মাঝে'র কল্পদৃশ্য আরো খানিক ভাবা যেত নাকি যেত না, ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে কিনা, কিউ-এর নবারুণের ক্ষেত্রে এই প্রশ্নটা জরুরী। কারণ 'মিউচ্যুয়াল ম্যান', যা কিনা অদ্যাবধি নবারুণের যে কোনো টেক্সটের শ্রেষ্ঠ অন স্ক্রীন ট্রান্সলেশন (হারবার্ট মাথায় রেখেই) তা কিন্তু দর্শককে ছুঁয়ে যাচ্ছে কিউ-এর কল্পনাশক্তির জোরেই। তার উপর মিউচ্যুয়াল ম্যানের পর এসেছে ফ্যাতাড়ু, অতএব একটির জোর অন্যটিকে দুর্বল করে দেয় খানিক। তবে আমার কাছে এসবের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, আদৌ কোনো দরকার ছিল কি একটি 'ডকু'তে হঠাৎ কিছু গল্প ঢুকে পড়ার? আমার ধারণা এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্যে চলে যেতে হবে একদম ছবির শুরুতে—একটি আপাত ইনসিগনিফিক্যান্ট ডিপার্চার থেকে শুরু করলে, পুরো ছবিটি এবং ছবিটির বিরুদ্ধে ওঠা নানান অভিযোগের উত্তর দেওয়া যাবে বলেই আমার ধারণা। ছবির একদম শুরুর দিকে শোনা যায়, ''যে পিতা সন্তানের লাশ শনাক্ত করতে ভয় পায়, তাকে আমি ঘৃণা করি''। ভেসে ওঠে সাবটাইটেল—''I spit on that father . . .''। এখানে লক্ষ্যণীয়, যে কবিতাটি আবৃত্তি করা হচ্ছে, তা বদলাবার কোনো সম্ভাবনা

নেই। অর্থাৎ 'ঘৃণা' শধটি যখন উচ্চারিত হচ্ছে, সেই সময় কান মারফৎ মগজে যে অভিগাত তৈরি হয়, কিউ-কে সাবটাইটেল খুঁজতে হচ্ছে তার অনুরূপ কিছু শব্দ, যা পড়ে অন্তত তার কাছাকাছি কোনো অভিঘাত তৈরি হয়। সেই শব্দ কি 'হেট' হতে পারত? না। একেবারেই না। এখানে একটা ডিপার্চাররের বা এস্ক্যালেশনের প্রয়োজন ছিলই, যা নবারুণের রাগকে, ঘৃণাকে, অ্যামপ্লিফাই করতে পারবে। 'হেট' শধের মধ্যে সেই জোর তৈরিই হত না। এই ছোট্ট অবজার্ভেশন থেকে শুরু করলে বোঝা সম্ভব যে এ ছবি অনেক কিছুকেই ম্যাগনিফাই করে। টেক্সট থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়েও মাত্রার তারতম্য ঘটিয়ে চলে অবিরত। এ প্রসঙ্গে ফিরব আবার এবং তখন হয়তো বোঝানো যাবে কেন এই সাবটাইটেলটি ছবিটি পড়ার ক্ষেত্রে জরুরি। তবে তার আগে অন্য কিছু কথা।

নবারুণের পাঠক হিসেবে একটা না একটা সময়ে অনেককেই কিছু প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে—পপুলার প্রশ্ন বা অভিযোগগুলি মূলত নবারুণের সৃষ্ট চরিত্রদের সংলাপে উঠে আসা খিস্তিকে ঘিরে। কেউ মনে করেছেন চরিত্রগুলো মিসোজিনিস্ট, কেউ সেই চরিত্রগুলোর শ্রেণিগত অবস্থান দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন তাদের মিসোজিনিস্ট হওয়াকে। কেউ আবার নেহাতই অসহিষ্ণু হয়ে লেখককেই মিসোজিনিস্ট আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু এসব তর্কে ঢোকার আগে, গোড়ার প্রশ্ন ঃ এই কথাগুলো উঠছে কেন? নিশ্চয়ই গালাগালগুলো বা চরিত্রদের তথাকথিত (শব্দটি জরুরি) ম্যাস্কুলিন কথাবার্তা কোথাও একটা আমাদের সভ্য কানে লাগছে? একটা ন্যূনতম অস্বস্তির জায়গা তৈরি হচ্ছে, গালাগালগুলো পুনরাবৃত্ত হওয়াতে? এবার প্রশ্ন, যে মানুষ নবারুণ পড়েননি, তাঁর সাথে যখন নবারুণের আলাপ হবে এই ছবির মাধ্যমে, তখন তার মধ্যে সেই অস্বস্তি ছড়িয়ে দেওয়া কি ছবিটির পরিচালকের কাজ নয়? সেটাও তো ডকুমেন্টেশনের প্রক্রিয়ার মধ্যেই থাকে বা থাকা উচিত। অর্থাৎ ছবিটি দেখে দর্শকের মধ্যে যেমন নবারুণ নিয়ে একধরনের ইন্টারেস্ট তৈরি হবে, তেমনই থেকে যাবে সম্ভাব্য সমালোচনার সূত্র। আর ঠিক এইখানে দাঁড়িয়ে কিউ-এর সামনে দুটো রাস্তা খোলা ছিল। হয় কিউকে বেশ কিছু এমন মানুষ বেছে নিতে হবে যাঁরা এই বিষয়ে কথা বলার বা সিরিয়াস প্রশ্ন তোলার যোগ্যতা রাখেন এবং সম্ভব হলে তাঁদের সাথে প্রশ্নোত্তর নিয়ে খেলা করার পর সেই প্রশ্ন সোজাসুজি নবারুণের কাছে পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু এক্ষেত্রে বিপজ্জনক একটা সম্ভাবনা থেকে যায় ঃ ছবিটি হয়ে উঠতে পারে সাক্ষাৎকারধর্মী বা সেমিনারের পেপার প্রেজেন্টেশন গোছের। কিউ সচেতনভাবে সেই ফর্মকে রিজেক্ট করছে, এখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষের সাথে কথোপকথন আছে, কিন্তু সেই অর্থে 'সাক্ষাৎকার' নেই (প্রসঙ্গত জয়রাজ ভট্টাচার্যের সাথে কথোপকথনটা আমার বেশ সেমিনার সেমিনার লেগেছে, সে দোষ জয়রাজের নাকি কিউ-র নাকি প্রচুর পড়াশোনা করার, তা আমি জানি না)। তাহলে কি উপায় ক্রিটিক হয়ে ওঠার?
এ প্রসঙ্গে যে উদাহরণ আমার মাথায় চট করে আসে (কারণ আমি ছবি বিষয়ে প্রবল অশিক্ষিত, আগেই বলেছি) তা ঋত্বিক ঘটকের একটি অসমাপ্ত ছবির, রামকিংকর বেজ-কে নিয়ে বানানো। একটি দৃশ্যে, ঋত্বিক রামকিংকরের কাছে জানতে চাইছেন মোষ এবং মাছের বিষয়ে। রামকিংকর কিছুতেই সন্তুষ্ট করতে পারছেন না ঋত্বিককে। একটি অসামান্য কথোপকথন হয় দুজনের মধ্যে এবং তারপরে বোঝা যায় যে ঋত্বিকের খুঁতখুঁতানি থেকেই গেল, তিনি মন থেকে মেনে নিতে পারলেন না রামকিংকরের বক্তব্য। একটি অসামান্য উদাহরণ, 'ক্রিটিক' হয়ে ওঠার, অপমান বা অসম্মান না করে। মজা হল, এই দৃশ্যটি এভাবে রচিত হতে পারে তার কারণ ঋত্বিক এবং রামকিংকরের ব্যক্তিগত সম্পর্কের, বন্ধুত্বের ডায়নামিক্স তাঁদের সেই স্পেস দেয়। নবারুণের ক্ষেত্রে কি সেই স্পেস ছিল? জয়রাজ ভটচাজ ছোটোবেলা থেকেই প্রচণ্ড পাকা এক হাওড়ার মাল, অতএব সেহাফপ্যান্টবেলায় ঢুকে পড়েছিল নবারুণের বাড়িতে। কিন্তু এর ক্ষেত্রে কিন্তু তা ঘটেনি। এ ছবির শুরুতে কিউ নবারুণকে আপনি সম্বোধন করে, শেষে তা তুমি-তে দাঁড়ায়। অর্থাৎ পুরো ছবিটাই একটা জার্নি ঃ কিউ-নবারুণের। সেই জার্নির ডায়নামিক্স কিছুতেই ঋত্বিক-রামকিংকর নয়, অতএব ওই পদ্ধতিতে ক্রিটিক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা সেখানে ছিল না। আরো জরুরি ঃ কিউ এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র পরিচালক যে সত্যজিৎ-ঋত্বিক-মৃণালের হ্যাং ওভার থেকে বেরিয়ে এসে নিজের রাজনৈতিক বিশ্বাসের প্রেক্ষিতে নিজস্ব নন্দন-তত্ত্ব খুঁজে নিয়েছে। সে সযত্নে রিজেক্ট করেছে নস্টালজিক ক্যামেরাকোণ, মন দিয়েছে নতুনকে খুঁজতে (তাই 'তাসের দেশ' আর্গুয়েবলি কিউ-এর কমজোরি কাজগুলোর মধ্যে একটা হলেও এ কথা সত্যি যে তাসের দেশ বানানোর অধিকার বোধহয় কিউ-এরই ছিল)। স্রেফ এই জায়গা থেকেই বলা যায়, কিউ-এর পক্ষে ক্রিটিকাল হয়ে উঠতে গেলে একটাই জিনিসকে হাতিয়ার করতে হত—ম্যাগনিফিকেশন। নবারুণ যা, তার কিছু বেশি হয়ে ধরা দেবে ছবিতে। আর ঠিক এখানেই অনিন্দ্য-দা ঠিক, তিনি যথার্থই বলেছেন যে এ ছবি ফ্যান্ডম ম্যাশাপ। কিন্তু ঠিক এখানেই অনিন্দ্য-দা ভুল। কারণ তিনি ম্যাগনিফিকেশন নামক মুদ্রার একটি পিঠকে দেখছেন, যার নাম ফ্যান ফিকশন এবং মুদ্রাটাকে আইডেন্টিফাই না করতে পারায় তাঁর মনে হচ্ছে যে ফ্যান ফিকশন হয়ে ওঠার চোটে এ ছবি হারিয়ে ফেলল ক্রিটিক ভয়েস। আদতে ওই মুদ্রার অন্য পিঠ, যা বড়োই অন্ধকার, তা হল নবারুণের ক্রিটিক।
অন্তত যে অভিযোগটা নবারুণের দিকে বারবার উঠেছে নারীবাদীদের পক্ষ থেকে। ছবি দেখে বন্ধু দেবারতি বলেছিল, মেয়েদের ভয়েস সেভাবে পেলামই না। সত্যিই, মহিলাদের উপস্থিতি প্রায় নেই, এমনকী যেখানে আছে সেখানেও তা অদ্ভুতভাবে আছে। যেমন সপ্তর্ষির সৌরভের পাশে যে মহিলা আছেন। তাঁর প্রাথমিক উপস্থিতিটি বিচিত্র—তাঁর আঙুল নাড়া দেখানো হয়, যা না দেখালে মনে হত তিনি পুতুলমাত্র। মহাশ্বেতা দেবী এ ছবিতে না থাকলেও চলত। একশোবার চলত। কিন্তু খুব সিগনিফিক্যান্ট হয়ে ওঠে তার দু'মিনিটের উপস্থিতি, তাঁর বলা কথাগুলো এবং তাঁর চুপ হয়ে যাওয়ার পর ইচ্ছা করে কিউ-এর ক্যামেরার থেমে যাওয়া। এক ধাক্কায় কিউ অনেকগুলো গল্প বলে দেয়। আমার মুখে একটা হাসি ফুটে ওঠে, আমি ভালোবেসে কিউকে খিস্তি করে ফেলি, ''বোকাচোদা শালা!''।
যাঁরা ছবিটি দেখেছেন তাঁদের নিশ্চয়ই মনে থাকবে মহাশ্বেতা দেবী ওই দু'মিনিটেই কি বলেছেন, নিশ্চয়ই মনে থাকবে নবারুণের অভিমান, তাঁর মা-কে নিয়ে। ঠিক এখানেই, এও বোঝা যায়, নবারুণের আসলে দরকার ছিল একজন মা-কে, একজন কমরেডের থেকেও বেশি। সে কথা ছবির শেষদিকে বোঝাও যায় নবারুণের ভাষ্যে—''না আমার ভালোই লাগে''। পৃথিবীতে কোনো মানুষ নিখুঁত নন। তাই নবারুণ ভট্টাচার্যকে বুঝতে গিয়ে প্রণতি ভট্টাচার্যের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতেই হবে দর্শককে এবং সে যেন তাকিয়ে থাকে তা এনশিওর করতে কিউ অথবা আদ্রিয়ানকে ঢুকে পড়তেই হবে প্রণতি ভট্টাচার্যের হেঁসেলে। প্রেশারকুকারের সিটিতে বোনা হবে সাংসারিক ঝড় পেরিয়ে পাশে থেকে যাওয়ার গল্প, তা কি কোনো অংশে কম কমরেড হওয়া? কিউ এরকমভাবেই খেলেছেন, চুপ করে। জরুরি প্রশ্নগুলোকে মোটেই বাইপাস করেননি, বরং দর্শকের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন, যেমন দিয়েছেন নবারুণ, পাঠকের হাতে। এখানেই কিউ ভয়ঙ্কর সৎ থেকে যান। জাজমেন্টাল নন বা সাংবাদিক নন, কি ভাগ্যিস আনন্দ পট্টবর্ধনও নন (ব্যস, এইবার আমি শেষ)। কিউ-এর ডকুমেন্টেশন কোথাও নবারুণকে প্রশ্ন করে না যে

মশাই লিঙ্গ-রাজনীতি বিষয়ে আপনার স্ট্যান্ড কী? অথচ দর্শকের হাতে তুলে দেয় সম্ভাব্য প্রশ্নটি, ''আচ্ছা, সবই তো বুঝলাম, এমনকী এও বুঝলাম যে শেষ বয়সে কেউ কেউ তাঁকে প্রেডিক্টেবল মনে করেছে (রানা রায়চৌধরী বলেছেন, সম্ভবত), কিন্তু এই লোকটা কেমন একটা মিসোজিনিস্ট মনে হচ্ছে না?'' এগুলো সবই ঘটেছে কন্সট্যান্ট ঘটে চলা একধরনের ম্যাগনিফিকেশনের ফলেই যার সূত্রপাত ওই সাবটাইটেল থেকে। আশা করা যায়, এতক্ষণে বোঝা হয়ে গিয়েছে সাবটাইটেলের প্রসঙ্গটি শুরুতেই কেন উত্থাপন করা হয়েছিল।

তবে কিনা খুঁত কি নেই? খুঁতের মধ্যে অন্যতম, শেষের দিকে যেখানে অনেকে মিলে পাবলিক স্পেসে নবারুণ পড়েন, সেই রি-এর ঢুকে পড়া। অনিন্দ্য-দা বলেছেন এই অংশটি একটুও সাবভার্টেড হয় না। কিন্তু আমার মনে প্রবল দাগ কাটে এই মুহূর্তগুলো, কারণ নবারুণের বিপক্ষে ওঠা অভিযোগগুলো মূলতঃ নারীবাদীদের তরফ থেকেই আসে এবং এখানে দেখানো হয় নারীরা নবারুণ পড়ছেন, ওপেন স্পেসে। আমার কাছে এটা দুর্দান্ত কাউন্টার-অ্যাক্ট। প্রশ্ন একমাত্র রি-এর নবারুণ পড়ার অংশটি নিয়ে। এমন নয় যে আমি রি-এর বিরোধী, কিন্তু বাকি চরিত্রগুলোর 'রিয়েল লাইফ' নাম কি লোকে অত সহজে বলতে পারবে যত সহজে বলে দেবে ''এটা রি''? পারবে না। পারবে না বলেই পাবলিক স্পেসে পড়া নবারুণের মধ্যে হঠাৎ রি-এর মত তুলনামূলক সেলেব ফেস না ঢোকাই উচিত ছিল। এরকম আরো কিছু খুঁত আছে হয়তো। কিন্তু একটা ব্যাপার সহজ, কিউ তার দুর্বলতার জায়গা জানে। জানে বলেই সেটাকে তার শক্তিতে পরিণত করতে পেরেছে। মানে? যেমন সুরজিৎ-এর উপস্থিতি। সুরজিৎকে যাঁরা চেনেন, তাঁরা জানেন যে সুরজিৎ কথা রিপিট করেন, প্রায় মুদ্রাদোষের মতো। মনে করা যাক আমি হয়তো বললাম, ''সুরজিৎ-দা, নবারুণ কিন্তু এই ওয়ান পার্সেন্ট হোমোসেক্সুয়ালের কথাটা কিন্তু ঠিক বলেননি।'' বাক্য শেষ হতেই সুরজিৎ সেন হয়তো বলে উঠলেন, ''ওয়ান পার্সেন্ট'' অথবা ''হোমোসেক্সুয়াল'' অথবা ''ঠিক বলেননি'' (জাস্ট উদাহরণ দিচ্ছি)। অর্থাৎ একটা বিশেষধরনের কথা বলার স্টাইল। কিউ-কে কুর্নিশ। কিউ সুরজিতের এই কথা বলার স্টাইলটা দুর্দান্ত কাজে লাগিয়েছেন। ছবিটিতে সুরজিৎ একটি প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র হয়ে ওঠে প্রায়। নবারুণের বলা কথাগুলোর প্রেক্ষিতে সুরজিতের রিপিট করা শব্দগুলো অসামান্য হিউমার বয়ে আনে। একজন ভক্তের ভগবানকে দেখতে পাওয়ার, তার সাথে কথা বলতে পারার মধ্যে যে আনন্দবিহ্বলতা, তা ধরা পড়ে ছবিতে সুরজিৎ আর নবারুণের কথাবার্তায়। শব্দ এবং এডিটিং বরাবরই কিউ-এর জোরের জায়গা বলে আমার মনে হয়েছে, নবারুণেও সেই দক্ষতার ছাপ আছে। সর্বোপরি কিউ-এর সবথেকে বেশি যে কারণে সাধুবাদ প্রাপ্য, তা হল এই যে কিউ এই ছবিটা বানিয়েছে। এই ছবিটা বানানো উচিত ছিল অনেক আগে। ২০০৬-এর আগে। ইনফ্যাক্ট হয়তো ২০০০ সাল নাগাদ। অনেকেই উপন্যাস আর গল্পের রাইট কিনে নিয়ে বসে আছে আর শেষমেষ কবিতা কপচাচ্ছে। অন্তত কিউ ধক তো রেখেছে এই ছবি করার। কিউ না করলে, লিখে নিন, এ ছবি আর কেউ করতো না।

পরিশেষে আরেকটু পার্সোনাল হই। এই অংশে আবেগ থাকবে, স্বপ্ন থাকবে। ছবি সংক্রান্ত কোনো কথা আর বলা হবে না এখানে। আমি নিজেকে সামলেছি, এতক্ষণ। কিন্তু প্রথম নবারুণ পাঠের অভিঘাতটুকু না লিখে এ লেখা শেষ করলে তা বোধহয় ঠিক হবে না। আমার জীবনের প্রথম ও শেষ শান্তিনিকেতনি ঝোলাটা ক্লাস নাইনে কিনেছিলাম। টিফিনের পয়সা জমিয়ে হারবার্টও তাই। আরো কিছু বই, বাউন্স করা প্রথম প্রেমের চিঠির ছাই ভরা কাঁচের শিশি, চারকোলের টুকরো ইত্যাদির সাথেই হারবার্টের বইটা ঢুকে পড়ে ঝোলার ইনসাইড চেনে। আমি বুঝতেও পারি না, আমার বাবা ব্যাগটা কাচতে যায়। একে একে বেরিয়ে আসে বইগুলো, ছাই হয়ে যাওয়া প্রেমপত্র। উদমা ক্যালানি জোটে সেদিন। আমার ঝোলার ভিতরের পকেটে চারকোল দিয়ে লেখা ছিল, ''কে কখন কীভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করবে, সে সম্বন্ধে জানতে, বাবা, তোমার এখনো ঢের বাকি আছে।'' ঠিক এইটাই লেখা, নবারুণকে ভেঙে—নবারুণ তখন আমার হিরো। একটা করে চড় গালে এসে পড়ছে, আর আমি মনে মনে বলে চলেছি, আমি হারবার্ট হব বাবা আমি হারবার্ট হব। কেন হব জানি না কিন্তু জানি আমি, হারবার্ট হব। কিউ-এর ছবিতে একদল বাচ্চা নির্মল আনন্দে লাফিয়ে উঠে বলতে থাকে তারা বড়ো হয়ে ফ্যাতাড়ু হবে। ওদেরকে দেখে, মোটা ফ্রেম-মধ্যবিত্ত-ফ্ল্যাটনিবাসী এক কিশোরকে মনে পড়ে আমার। সে বিশ্বাস করত হারবার্ট হওয়া যায়। বাজেশিবপুরে স্ক্রীনিং-এর আগে যে বাচ্চা ছেলেটা প্রবল ফূর্তিতে আমাদের সাথে গলা মিলিয়ে ''বেবি কে, বেবি কে'' বলে লাফিয়ে উঠল প্রাণবন্ত, আর তারপরেই পর্দায় যখন আরেকদল বাচ্চা ছেলে ভেসে উঠল আর বলল ফ্যাতাড়ু হবে, আমি কেমন একটা বোকার মতো হেসে ফেললাম, নোনাজলে ভেজা সে হাসিতে, মাইরি বলছি, লেখা আছে—ফ্যাঁত ফ্যাঁত সাই সাই। ■

বাংলাল্যাবক্